(Control of Inflation)

একবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। **মুদ্রাস্ফীতিকে দুভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। একটি দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং অপরটি মোট চাহিদাকে হ্রাস করা।** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : (1) **আর্থিক পদ্ধতি** (Monetary measures), (2) **রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি** (Fiscal measures) এবং (3) **অন্যান্য পদ্ধতি** (Other measures)। তিনটি পদ্ধতি নিয়ে আমরা একে একে আলোচনা করব।

আর্থিক পদ্ধতি : মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সেগুলি সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই গ্রহণ করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারে। **প্রথমত,** ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি দমন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে উদ্যোক্তারা কম পরিমাণ বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের পরিমাণ কমলে সামগ্রিক চাহিদাও কমে আসে। **দ্বিতীয়ত,** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক রক্ষিত রিজার্ভের অনুপাতকে বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি রিজার্ভের অনুপাত বাড়ানো হয় তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বেশি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে রিজার্ভ আকারে জমা রাখতে হয়। তার ফলে তারা কম পরিমাণ ঋণ দিতে পারবে। তখন সামগ্রিক চাহিদা কমবে। **তৃতীয়ত,** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রি করে জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নিতে পারে। জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমে গেলে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কমে গেলে কম পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি হবে। তার ফলেও সামগ্রিক চাহিদা কমবে। **চতুর্থত,** মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিতে নিষেধ করতে পারে।

রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি : বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে আর্থিক পদ্ধতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আর্থিক পদ্ধতি অপেক্ষা সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমত,** সরকার নিজের ব্যয় কমাতে পারে। আমরা জানি যে সামগ্রিক চাহিদার একটি অংশ সরকারী ব্যয়। কাজেই সরকার যদি নিজের ব্যয় হ্রাস করে তাহলে সামগ্রিক চাহিদা কমবে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে যেগুলি অনাবশ্যক ব্যয় বা অনুৎপাদক ব্যয় সেগুলি কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** সরকারী ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণও কমাতে হবে। বেসরকারী ব্যয় কমানোর একটি উপায় করের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নতুন কর স্থাপন করা। অধিক পরিমাণ কর আরোপ করলে যে টাকাটা জনগণ কর আকারে সরকারকে দিচ্ছে সেই টাকাটা তারা ব্যয় করতে পারে না। তার ফলে ব্যয়যোগ্য আয়ের পরিমাণ কমে আসে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। **তৃতীয়ত,** সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

করতে পারে। কর বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। যথাসম্ভব করের হার বৃদ্ধি করার পরও জনগণের নিকট বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা থেকে যেতে পারে। সরকার জনসাধারণের কাছে বণ্ড বা ঋণপত্র বিক্রি করে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে বাড়তি অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে সরকার তুলে নিতে পারে। তার ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। অনেক সময় সরকার আয় থেকে ব্যয় বেশি করে এবং নতুন অর্থ সৃষ্টি ক'রে এই ঘাটতি ব্যয় মেটানো হয়ে থাকে। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকারের উচিত ঘাটতি ব্যয়কে একেবারেই পরিত্যাগ করা। সম্ভব হলে সরকারের ব্যয় কমিয়ে এবং আয় বাড়িয়ে বাজেটে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা উচিত।

চতুর্থত, সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পও চালু করতে পারে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে তাদের আয়ের এক অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হয়। মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটলে এই সঞ্চয় ব্যক্তিকে ফেরৎ দেওয়া হয়। এইভাবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা কমানো সম্ভব।

অন্যান্য পদ্ধতি ঃ আর্থিক পদ্ধতি ও রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমেই উৎপাদন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে হয়। যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা না আসে এবং তার আগেই যদি দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়তে থাকে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তাছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বরাদ্দ ব্যবস্থা বা র‍্যাশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম সরকার বেঁধে দিতে পারে। আবার র‍্যাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী জনসাধারণের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে। এইভাবে দাম নিয়ন্ত্রণ এবং র‍্যাশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দামস্তর কম রাখা সম্ভব হয়।